প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি ও প্রতিযোগিতা কমিশনের দায়িত্ব

ড. এ কে এনামুল হক

ব্যবসা-বাণিজ্যে মুনাফা অর্জন করা সব ব্যবসায়ীর লক্ষ্য। মুনাফা অর্জনকে সব ধর্ম সব সমাজ উপার্জনের একটি গ্রহণীয় উৎস হিসেবে স্বীকার করে। তবে মুনাফা অর্জনের সব উপায় মানবসমাজে কখনো গ্রহণযোগ্য ছিল না। যেমন— মুনাফার লোভে ওজনে কম দেয়া কিংবা খাদ্য বা ওষুধে ভেজাল মেশানো সমাজ কখনই নৈতিক বলে মনে করেনি। মুনাফা অর্জনের এ পদ্ধতিকে তাই সব সরকারই আইনের মাধ্যমে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। ভেজাল কিংবা নকল পণ্য বিক্রির ফলে জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয় কিংবা ভোক্তাকে ধাপ্পা দেয়া হয়। এ ধাপ্পাবাজি থামাতে আমাদের দেশেও তাই রয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন। তবে কেবল ভেজাল কিংবা নকল পণ্য উৎপাদন করেই যে অনৈতিক মুনাফা অর্জন করা যায়, তা নয়। বাজারে পরিকল্পিতভাবে প্রতিযোগিতা থামিয়েও অত্যধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। এ পদ্ধতিতে বাজারে পণ্যে ভেজাল না করেই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা যায়। অর্থনীতির পরিভাষায় বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা বজায় থাকলেই যে সমাজ লাভবান হয়, সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতেই আজকের লেখা।

এডাম স্মিথ বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি মোক্ষম শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তার মতে, বাজারের একটি 'অদৃশ্য হাত' রয়েছে। তার দৃষ্টিতে এই অদৃশ্য হাত রয়েছে বলেই বাজার স্থিতিশীল থাকে, বাজারে পণ্য সরবরাহের সংকট তৈরি হয় না কিংবা কেউ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে পারে না। এই অদৃশ্য হাত রক্ষা করতে পারে কেবল প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা। তার মতে, বাজারে চাহিদা থাকলে তা কেউ না কেউ সরবরাহ করবেই। কথায় বলে, টাকায় বাঘের দুধও মেলে। কথাটি এরই প্রতিফলন। প্রতিযোগিতার এ দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে প্রতিযোগিতা থাকলে বাজারের আকার বৃদ্ধি পায়, উদ্ভাবন হয় নতুন পণ্যের কিংবা নতুন বিপণন ব্যবস্থার, পণ্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বাড়ে না এবং বাজারে নতুন নতুন উদ্যোক্তা জড়ো হয়। ফলে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় কর্মসংস্থান। অর্থনীতি চাঙ্গা থাকে, প্রবৃদ্ধি বাড়ে। অন্যদিকে অদৃশ্য হাত যখন অস্পৃশ্য হাতে পরিণত হয়, যখন প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা টিকে না, তখন বাড়ে কিছু লোকের মুনাফা, কমে যায় উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান আর বাড়ে পণ্যমূল্য। তাই সরকারের একটি প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য হয় কী করে বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রাখা যায়।

প্রতিযোগিতার অভাব বাজারকে ঠেলে দেয় একচ্ছত্র বাজারের পথে, যাকে মনোপলি বলে জানি। আপনাদের অনেকেই মনোপলি খেলার কথা জানেন। যারা খেলেছেন তারা হয়তোবা জানেন যে, এ খেলার শেষ নেই। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কেউ বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি করতে পারেন না। ফলে গেমটি খেলে সবাই আনন্দ পান। গেমটির শুরু হয় কয়েকজন খেলোয়াড়ের সমান পুঁজি দিয়ে। অর্থাৎ খেলোয়াড়দের সবাই সমান অবস্থায় খেলা শুরু হয়। ছক্কাগুটির সাহায্যে খেলোয়াড়রা একের পর এক সম্পত্তি কিনে নেন এবং প্রতিটি সম্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট হারে ভাড়া পেতে থাকেন। খেলায় ক্রয়কৃত সম্পত্তিতে বিনিয়োগও করা যায় আর তাতে প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারে। বিনিয়োগের ফলে সম্পত্তিটির ভাড়ার আয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কিছুক্ষণ খেলার পরই দেখবেন খেলা থেমে আছে। অর্থাৎ এর পর কেবল চাল দেবেন আর ভাড়া গুনবেন (যখন অন্যের সম্পত্তিতে পা দেবেন) বা ভাড়া দেবেন। ক্রমান্বয়ে খেলাটি স্থবির হয়ে যায়।

বাজার ব্যবস্থাও এ রকম। নিয়মানুবর্তী ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার একসময় একঘেয়ে হয়ে পড়ে। অর্থনীতির ভাষায় তাকে বলে স্বাভাবিক মুনাফার বাজার। ভোক্তার কাছে এর চেয়ে ভালো বাজার ব্যবস্থা আর নেই। কারণ এ বাজারে দাম স্থিতিশীল থাকে, কেউ অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারেন না। কিন্তু উৎপাদনকারী তা পছন্দ করেন না। ফলে এ পর্যায়ে নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে তারা বাজারে নিজের অবস্থান অন্যের চেয়ে আলাদা করার চেষ্টা করে থাকেন। তাতে তারা কিছুটা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করেন। কোনো উদ্ভাবনীর ফলে কেউ যদি পণ্যের মূল্য বাড়িয়েও দেন, তাতে ক্রেতা খুব একটা অখুশি হন না। কারণ এ উদ্ভাবনী ক্রেতাকে কিছুটা লাভও দিয়ে থাকে। যেমন ধরুন, একজন চাল বিক্রেতা যদি চাল এমনভাবে প্রক্রিয়াজাত করেন যে তার ফলে আপনি চাল না ধুয়েই রান্না করতে পারেন, তবে তার জন্য আপনি বা আমিও একটু বেশি দাম দিতে দ্বিমত পোষণ করি না। যুক্তরাষ্ট্রের চালের বাজারে আংকল বেন (Uncle Ben rice) চাল তারই একটি উদাহরণ। কিন্তু যদি কেউ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে চালের দাম বাড়িয়ে দেন, তবে তা নিয়ে আমরা কেউ খুশি হই না। এই দ্বিতীয় পন্থায় বাজার হয় অপ্রতিযোগিতামূলক। মনোপলি খেলায় তাই থাকে নিয়ম-কানুন, যার ফলে শেষ পর্যন্ত কেউ মনোপলিস্ট না হলেও খেলাটিতে সেই-ই জিতে যায়, যার সম্পত্তির পরিমাণ বেশি। বুঝতেই পারছেন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমান অবস্থা থেকে শুরু করেও অসমান অবস্থায় যাওয়া যায়।

একইভাবে বাজারে প্রতিযোগিতার অর্থ এই নয় যে, সবাই শেষ পর্যন্ত সমানই থেকে যাবে। বিনিয়োগ, দক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি কিংবা বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যখন একজন বিক্রেতা অন্যজনকে ডিঙিয়ে যান, তখন বাজার ব্যবস্থায় সবাই সমান না হলেও তাকে কেউ ধাপ্পাবাজি কিংবা শঠতা বলে আখ্যায়িত করেন না। আবার ক্রেতারাও এ ব্যবস্থাকে কখনই অন্যায় মনে করেন না। প্রশ্ন হলো, কে এ বাজার ব্যবস্থাকে প্রতিযোগিতামূলক রাখতে পারবে?

আগেই বলেছি বাজার ব্যবস্থায় অপ্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তার আদি রূপ হলো, বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য সৃষ্টি করা। তাই দেখবেন প্রাচীনকালেও এ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আইন ছিল। পৃথিবীর বহু দেশে এর ফলে মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর করা হয়েছিল। তবে এতে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। বাজার যখন বিকাশমান, যখন নতুন নতুন ক্রেতা বা বিক্রেতার আগমন ঘটে, তখন একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। তাই এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও অকার্যকর হয়ে যায়। সরকারকে নতুনভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের কথা চিন্তা করতে হয়। ফলে ১৮৮৯ সাল থেকে আসে বাজারে প্রতিযোগিতা আইন। ১৮৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শ্যারমান অ্যাক্ট ছিল অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার নিয়ন্ত্রণের একটি যুগান্তকারী আইন। এ আইনের মাধ্যমে বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে সরকার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার সৃষ্টি করে। এ আইনের দ্বারা কিন্তু মনোপলি রহিত হয় না। কারণ অর্থনীতির পরিভাষায় কোনো কোনো পণ্য বা সেবার জন্য মনোপলিই হয়তোবা একটি কার্যকর ব্যবস্থা। তাই আইনের উদ্দেশ্য হলো— যদি নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে বাজারের অপ্রতিযোগিতামূলক অবস্থা জনস্বার্থে ক্ষতিকর, তবেই সরকার তা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। বুঝতেই পারছেন সব মনোপলি ক্ষতিকর নাও হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একটুখানি অপ্রতিযোগিতা ক্ষতিকরও হতে পারে।

১৮৯০ সালের পর পৃথিবীর ১৪০টির মতো দেশে ক্রমে একই ধরনের আইন তৈরি হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য— বাজারে উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা করা। মনে রাখতে হবে বাজারে উৎপাদকের স্বার্থ সুরক্ষিত না হলে উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। প্রায় ১৩০ বছর পর আজ যখন এ বিষয় নিয়ে আমরা ভাবছি, তখন জল বহুদূর গড়িয়েছে। বাজার ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বাজারে অপ্রতিযোগিতামূলক অবস্থা এখন আর খালি চোখে দেখা যায় না। বাজারে ভোক্তা বা উৎপাদকের গৃহীত কোনো ব্যবস্থায় যদি দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত দেশের সার্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কেবল তখনই তাকে অপ্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

প্রতিযোগিতা কমিশনকে বুঝতে হবে যে, তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা কিংবা বাজারকে অপ্রতিযোগিতামূলক অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তাদের গৃহীত পদক্ষেপ আর ১০টি কর্তৃপক্ষের মতো নয়। কমিশনকে বুঝতে হবে কোন পণ্যে কীভাবে প্রতিযোগিতা হ্রাস পাচ্ছে। তাদের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে হবে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ স্পৃহা, উদ্ভাবিত হবে নতুন পণ্য কিংবা আসবে নতুন উৎপাদক। কমিশনের নেয়া ব্যবস্থাই হবে বাজারে সুলভ মূল্যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার একমাত্র পথ। তাতে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে

একজন বিক্রেতা এখন অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে বাজারে তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। বাংলাদেশের কথাই ধরুন, আমাদের দেশে সাবান ব্যবহারকারীর সংখ্যা কোটির পর। কিন্তু বহুদিন ধরে বাংলাদেশের সাবান বলতে ছিল কেবল কাপড় কাচার সাবান। 'কামালের বল সাবান' কিংবা পচা সাবানের নাম অনেকেরই মনে থাকবে। লিভার ব্রাদার্সের লাক্স কিংবা তিব্বতের সাবান ছিল আমাদের কসমেটিক সোপ। এ দুই কোম্পানির আধিপত্য এতটাই প্রকট ছিল যে, বিদেশ থেকে কেউ দেশে এসে সাবান উপহার দিলে আমরা খুশিতে আটখানা হয়ে যেতাম। কী কারণ? কারণ বাজার ছিল অপ্রতিযোগিতামূলক। ফলে নতুন ধরনের সাবান বাজারে আসেনি। যারাই চেষ্টা করেছে এ বাধা ভাঙতে, তারাই ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আমাদের দেশে না হয়েছে নতুন উদ্ভাবন, না হয়েছে নতুন সাবান তৈরির কারখানা। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যগুণে অ্যারোমেটিক ও কেয়া বাজারে এসেছে। তাদেরও বাজারে ঢুকতে হয়েছে চোরাগলি দিয়ে। বলতে হয়েছে যে, সাবান হতে হবে হালাল। এই উদ্ভট কিন্তু একটি কার্যকর উদ্ভাবনী শক্তি দিয়েই আমাদের সাবান বাজারে যাত্রা শুরু। বাজারে এসেছে নতুন কোম্পানি। বেড়েছে বাজারের আকার। বেড়েছে বাজারের বৈচিত্র্য। সবই সম্ভব হয়েছে কয়েকজন উৎপাদকের উদ্ভাবনীর জোরে। আর ঘটনাটি ঘটাতে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় ২৫ বছর। বলতে পারেন— সরকার কী করতে পারত? দেখবেন বাজারে যখনই দেশী কোম্পানি ঢুকতে চেয়েছে, তখনই বড় কিংবা বিদেশী কোম্পানি তার আর্থিক শক্তিকে পুঁজি করে অন্যদের থামিয়ে দিয়েছে। বড় কোম্পানি ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি করেও বাজার ধরে রাখতে পারে। উঠতি বা নতুন কোম্পানির পক্ষে তা সম্ভব নয়। কোনো নতুন বা ক্ষুদ্র উৎপাদক যখন এ অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন সে কার কাছে প্রতিকার চাইবে। কিংবা ধরুন কোনো ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে বসে আছে কিন্তু সরকারের কোনো বিভাগ বা দপ্তরের কালক্ষেপণমূলক নিয়মের ফলে তার ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে, তখন তার প্রতিকারে সে কোথায় যাবে? কার কাছে সে পরিত্রাণ পাবে? পরিত্রাণের ব্যবস্থা সহজ ও নিয়মানুগ না হলে বিনিয়োগ থমকে থাকে। নতুন বিনিয়োগ হয় না। যা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। কিংবা ধরুন কোনো ক্ষেত্রে বাজারে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনকারীরা জোটবদ্ধ হয়ে নতুনদের বাজারে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে, তখন বাজার ক্রমাগত সংকুচিত হয়। লাভবান হন জোটবদ্ধ উৎপাদনকারীরা আর ক্ষতিগ্রস্ত হন ক্রেতারা। আমাদের দেশে যাত্রীবাহী বাস পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন অবস্থা বিদ্যমান।

১৯৯৩ সাল। মাইক্রোসফট তখন তার অবস্থানের তুঙ্গে। বাজারে তাদের সঙ্গে অন্যদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব। তারা দেখতে পেল যে বাজারে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার অনেকগুলো ব্রাউজার রয়েছে। নেটস্কেট তার অন্যতম। মাইক্রোসফট তার অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গে বিনামূল্যে এক্সপ্লোরার জুড়ে দিল। বিনে পয়সায় এক্সপ্লোরার পেয়ে যাওয়ায় বাকি কোম্পানির বারোটা বাজতে লাগল। মাইক্রোসফটের এ ব্যবস্থাকে বলা হয় 'জুড়ে দেয়া' বা tie-in। ফলে অন্যদের বাজার ক্রমে সংকুচিত হতে থাকল। বাজার থেকে বাকিদের বেরিয়ে যাওয়ার আগেই ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা কমিশন অনুসন্ধান শুরু করে। তারা বুঝতে পারে যে, মাইক্রোসফট অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে বাকিদের বাজার থেকে হটিয়ে বাজার দখলের চেষ্টায় লিপ্ত। তাদের রায়ে তা রহিত হয়। ফলে আজ আমরা বাজারে এতগুলো ব্রাউজার দেখতে পাচ্ছি। ফায়ারফক্স কিংবা ক্রোমের মতো ব্রাউজার বাজারে এসেছে।

বাজারে অনেক সময়ই দেখতে পাবেন জোটবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, যা কারটেল নামে পরিচিত। আমাদের দেশে অনেকেই তাকে 'সিন্ডিকেট' বলেন। এ অবস্থায় গুটি কতক বিক্রেতা বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জোট তৈরি এবং বাজারে সরবরাহ সংকট সৃষ্টি করেন। ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এ ব্যবস্থা কাম্য নয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কার্যত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রচলিত আইনে সম্ভব হয় না। কারণ তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলে সরকার বিব্রত হয় আর ক্রেতাদের ক্ষোভ বাড়ে। আমাদের দেশেও তা নানা সময়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। কোনো কোনো সময় সরকার নিজেদের রক্ষা করতে গিয়ে হয়রানিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু কার্যত তা সবসময়ই ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে প্রতিযোগিতা আইন অত্যন্ত কার্যকর। পৃথিবীর বহু দেশে জোটবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণে প্রতিযোগিতা কমিশন সফল হয়েছে।

বাজারে উৎপাদনকারী নানা সময়ে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়ে থাকে, যার মাধ্যমে খুচরা বিক্রেতারা অন্য উৎপাদনকারীর পণ্য বিক্রয় করতে পারে না। এ ধরনের চুক্তি বা শর্ত নানাভাবে জুড়ে দেয়া হয়। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়। ফলে ভোক্তারা অধিক দামে সেই পণ্য কিনতে বাধ্য হন। অন্য প্রতিযোগী না থাকায় ভোক্তার পক্ষে বোঝা দুষ্কর যে পণ্যটির মূল্য ন্যায্য কী ছিল। এ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীর বহু দেশে প্রতিযোগিতা কমিশন কাজ করেছে।

কিংবা ধরুন কোনো বিক্রেতা বাজার দখলের উদ্দেশ্যে বাজারে পানির দামে পণ্য বিক্রয় করতে শুরু করেন। তাতে ক্রেতারা ক্রমে তার পণ্য বা সেবা গ্রহণ করবেন। আপাতদৃষ্টিতে তাতে ক্রেতারা লাভবান হবেন। কিন্তু যখন অন্য বিক্রেতারা বাজার থেকে চলে যাবেন তখন দাম বাড়িয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেবেন। এমন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অন্য উৎপাদকরা কার কাছে যাবেন? নতুন নতুন সেবা বা ব্যবসা বাজারে আসছে। তাদের আচরণ যদি বাজারে প্রতিযোগিতামূলক না হয়, তবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাড়বে না। বাড়বে না কর্মসংস্থান। সব বিনিয়োগকারী আশা করে, বাজারে তার অবস্থান টিকিয়ে রাখতে সে ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাবে। প্রতিযোগীর অন্যায় প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু যদি তা না হয় তখন কার কাছে যাবে? অনেক সময় দেখা যায়, প্রতিযোগিতা কমিয়ে আনতে একটি কোম্পানি অন্য একটি কোম্পানিকে একীভূত করে কিংবা কিনে ফেলে। সেক্ষেত্রে বাজার ক্রমাগত অপ্রতিযোগিতামূলক হয়ে যাবে। তখন বাজারকে কে রক্ষা করবে?

একজন উৎপাদনকারী উৎপাদনের সব পর্যায়ের মালিকানা নিজ হাতে রাখতে পারেন। যাকে বলা হয় vertical integration বা উল্লম্বিক একীভূতকরণ। এ ব্যবস্থা বেআইনি কিংবা অনৈতিক নয়। কিন্তু এর ফলে কোনো কোনো সময় বাজারে একচ্ছত্র ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। দেখা যায় যে, এর ফলে উপকরণ সরবরাহকারীরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না। ফলে বাজারে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। একসময় বাজার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। অর্থাৎ উল্লম্বিক একীভূতকরণের ফলে যদি কখনো অপ্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি হয়, তা নিয়ন্ত্রণের উপায় সরকারের হাতে থাকা দরকার। প্রতিযোগিতা আইন তারই একটি প্রয়াস।

সব মিলিয়ে বুঝতেই পারছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে আইনসিদ্ধ হলেও প্রকারান্তরে তার মাধ্যমে কোনো কোনো পণ্যের বাজার অপ্রতিযোগিতামূলক হয়ে যেতে পারে। ফলে দেশের স্বার্থ ব্যাহত হয়। তারই সমাধানকল্পে সরকার প্রতিযোগিতা আইন তৈরি করে। বাংলাদেশ সরকারও তা করেছে ২০১২ সালে। সৃষ্টি হয়েছে প্রতিযোগিতা কমিশন। এ কমিশনের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক।

প্রতিযোগিতা কমিশনকে বুঝতে হবে যে, তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা কিংবা বাজারকে অপ্রতিযোগিতামূলক অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তাদের গৃহীত পদক্ষেপ আর ১০টি কর্তৃপক্ষের মতো নয়। কমিশনকে বুঝতে হবে কোন পণ্যে কীভাবে প্রতিযোগিতা হ্রাস পাচ্ছে। তাদের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ স্পৃহা, উদ্ভাবিত হবে নতুন পণ্য কিংবা আসবে নতুন উৎপাদক। কমিশনের নেয়া ব্যবস্থাই হবে বাজারে সুলভ মূল্যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার একমাত্র পথ। তাতে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। তবে তাদের মনে রাখতে হবে বাজার ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য একটি প্রয়োজনীয় লক্ষণ। তাই বিভিন্ন পণ্য বা সেবায় একই ব্যবস্থা কার্যকর হবে না। আর এজন্যই এ কমিশনকে নির্ভর করতে হবে গবেষণার ওপর। বাজারে প্রতিযোগিতার অভাব হয়েছে কিনা, তা নির্ধারণ না করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতাকে ধ্বংস করতে পারে। এ সত্য অনুধাবন করে প্রতিযোগিতা কমিশনকে হতে হবে বিবেচক ও বিচক্ষণ। কমিশনকে বুঝতে হবে যে, তাদের গৃহীত ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী পাবেন নির্ভরযোগ্যতা আর ভোক্তা পাবেন স্বস্তি।

[নিবন্ধটির অংশবিশেষ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত একটি কর্মশালায় পঠিত]

লেখক : অর্থনীতির অধ্যাপক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি